বেরিয়ে এসেছিল যে, আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন না বলাটা আসলে ঠিক হল না, বলা উচিৎ মানতে চাইলেন না। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্যালাক্সিগুলোর একে অপরের উপর হুমরি খেয়ে পড়বার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আইনস্টাইন তার গাণিতিক সমীকরণসমূহে একটি কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে মহাবিশ্ব চুপসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারসাম্য ও স্থিতাবস্থা পাবে। এটিই সেই বিখ্যাত 'মহাজাগতিক ধ্রুবক' (Cosmological constant) যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই স্থিতিশীল ও স্থির মহাবিশ্ব প্রসারিতও হয় না, আবার সঙ্কুচিতও হয় না। কিন্তু আইনস্টাইনের আস্থায় অচিরেই চির ধরল।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল (১৮৮৯ - ১৯৫৩) সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে বিখ্যাত ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপের (হুকার প্রতিফলক) সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে এরা সকলেই একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয়, বরং ক্রমপ্রসারমান।

কী ভাবে বুঝলেন ব্যাপারটি হাবল? বুঝলেন ডপলার প্রপঞ্চ (Doppler effect) থেকে পাওয়া লোহিত ভ্রংশ (red shift) প্রত্যক্ষ করে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা যাক। ধরুন আপনি একটি রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে অনেক দূর থেকে ট্রেন যখন হুঁইসেল বাজাতে বাজাতে যতই আপনার দিকে আসতে থাকে, ততই হুঁইসেলের শব্দ আপনার কানে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর শোনায়। ট্রেনটি আপনাকে অতিক্রম করে চলে গেলে এর তীক্ষ্ণতাও ক্রমশ কমে আসে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে ইংরেজিতে ডপলার ইফেক্ট, বাংলায় ডপলারের প্রপঞ্চ। তীক্ষ্ণ শব্দের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিক্যুয়েন্সি বেশি অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম। শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনের অর্থ হলো ফ্রিক্যুয়েন্সির পরিবর্তন। এ তো গেল শব্দের কথা। আলোর ক্ষেত্রে তো আর শব্দ শোনার ব্যাপার নেই, সেক্ষেত্রে যা ঘটে তা হলো ফ্রিক্যুয়েন্সি পরিবর্তনের সাথে দৃশ্যমান আলোর রঙ-এর পরিবর্তন।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক একটি দ্রুতগামী রকেট পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল প্রচ বেগে, যা মোটামুটি আলোর দ্রুতির সাথে তুলনীয়। এখন রকেটের দ্রুতি বাড়তে থাকলে অদ্ভুত একটি ব্যাপার ঘটবে। রকেটের যাত্রীরা দেখবে যে, সামনের নক্ষত্ররাজি থেকে যে আলো রকেটের দিকে আসছে তা ক্রমশ নীলচে দেখাচ্ছে। সহজ কথায়, রকেটের সামনে অবস্থিত সব নক্ষত্রকেই যাত্রীদের চোখে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক নীলাভ মনে হবে। আর রকেটের পেছনে অবস্থিত তারাগুলোকে যাত্রীদের কাছে রক্তাভ বলে মনে হবে। আসলে এখানেও রেলগাড়ীর বাঁশীর শব্দের মতো সেই ফ্রিক্যুয়েন্সি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন। আমাদের চোখে দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, আর বেগুনী আলোর সবচেয়ে কম। অন্যান্য রঙের আলো, যেমন নীল-সবুজ-হলুদ থাকে এই দুই প্রান্তীয় সীমার মধ্যে। রঙের পরিবর্তনের এই জ্ঞানটাই কাজে লাগালেন এডুইন হাবল।

গ্যালাক্সিগুলোর লালচে হয়ে যাওয়া, যাকে উপরে লোহিত ভ্রংশ নামে অভিহিত করা হয়েছে, দেখে হাবল বুঝলেন যে গ্যালাক্সিগুলো আসলে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সরণ কিন্তু ঘটছে একটি নিয়মকে অনুসরণ করে - এই সরণের হার এদের মধ্যে দূরত্বের সমানুপাতিক। ব্যাপারটি বরং উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যাক। তিনটি ছায়াপথের (গ্যালাক্সির) কথা বিবেচনা করা যাক; মনে করি প্রথম ছায়াপথটি থেকে দ্বিতীয়টি যত দূরে রয়েছে, তৃতীয়টি রয়েছে তার দ্বিগুণ দূরে। ধরে নেই আমরা বাস করছি প্রথম ছায়াপথটিতে। এখন হাবলের নিয়ম অনুযায়ী মহাশূন্যের দিকে তাকালে আমরা দেখব আমাদের অবস্থান থেকে তৃতীয় গ্যালাক্সিটি দ্বিতীয়টির চাইতে দ্বিগুণ দ্রুতিতে সরে যেতে থাকবে। হাবলের এই আবিষ্কার বিশ শতকের জ্যোতির্বিদ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই উদ্ঘাটিত হলো যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারিত হচ্ছে। হাবলের আবিষ্কারের পর আইনস্টাইন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, গাণিতিক সমীকরণে মহাজাগতিক ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত করে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল করার চেষ্টাটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল (greatest blunder)। কিন্তু সত্যিই কি আইনস্টাইন এত বড় ভুল করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে- এ নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহাবিশ্ব যে প্রসারমান তা না হয় বুঝা গেল, কিন্তু কি ধরনের এই প্রসারণ? এই প্রসারণ কি কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ঘটছে ? অন্য কথায়, মহাবিশ্বের কি কোনও কেন্দ্র রয়েছে? উত্তর হচ্ছে না, নেই। আমাদের গ্যালাক্সি থেকে হয়তো মনে হতে পারে অন্য সব গ্যালাক্সি যেহেতু আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (পৃথিবীর বুকে টেলিস্কোপ বসিয়ে দেখলে অন্তত তাই মনে হবে), আমরাই বোধ হয় এর কেন্দ্রে, যেমনটি ভূকেন্দ্রিক জ্যোতির্বিদরা এককালে পৃথিবীকেই ভাবত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। বস্তুত তা নয়। মহাবিশ্বের প্রসারণ আসলে সম্পূর্ণ সুষম, অর্থাৎ যে কোনও গ্যালাক্সি থেকে এই পরীক্ষা সম্পাদন করলে একই ফলাফল পাওয়া যাবে; মনে হবে অন্য গ্যালাক্সিসমূহ দূরত্বের সমানুপাতিক হারে সেই গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই কোনও গ্যালাক্সিই নিজেকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে দাবি করতে পারে না।

ব্যাপারটি পাঠকদের কাছে উপরের ছবির ফোলানো বেলুনের উদাহরণ দিয়ে আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বেলুনের বহির্পৃষ্ঠটিকে স্থান রূপে কল্পনা করা যাক। বেলুনের গায়ে কিছুটা দূরে দূরে ছোট ছোট কতকগুলো ফুটকি চিহ্ন এঁকে দেয়া যাক এবং ভাবা যাক এগুলো এক একটি গ্যালাক্সি। এখন ফুঁ দিয়ে বেলুনটিকে যতই ফোলানো যাক ফুটকিগুলোর (মানে গ্যালাক্সিগুলোর) পারস্পরিক দূরত্ব কিন্তু ক্রমশ বাড়তে থাকবে, কিন্তু কোনও গ্যালাক্সিই দাবি করতে পারে না যে সে বেলুনের বহির্পৃষ্ঠের কেন্দ্রে, কারণ ফোলানো বেলুনটির বহির্পৃষ্ঠের তো কোনও কেন্দ্র নেই, নেই গোলাকার ফুটবল পৃষ্ঠের।

গ্যালাক্সিগুলো যে পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তা দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন যে, অতীতে নিশ্চয়ই এরা খুব কাছাকাছি ছিল। আর এ ধারণা করাও বোধহয় অমূলক নয় যে, সৃষ্টির আদিতে তাহলে সবকিছুই খুব ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় গাট-বন্দী (densely packed) হয়ে ছিল। আর আদি সেই অবস্থা থেকেই সবকিছু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে আকস্মিকভাবে । এটিই আজকের দিনের বিখ্যাত 'বিগ ব্যাং' (big bang) বা মহাবিস্ফোরণের ধারণা। এ ধারণা অনুযায়ী প্রায় ১৫০০ কোটি (১.৫×১০^৯) বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে অতি উত্তপ্ত এবং অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জীভূত অবস্থা থেকে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই উত্তপ্ত ঘনীভূত অবস্থাটিকে ইংরেজিতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে 'hot super dense state' আর পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় এর নাম হলো অদ্বৈত বিন্দু বা 'singularity point'। স্থান ও কালের ধারণাও এসেছে এই মহা বিস্ফোরণ ঘটবার পর-মুহূর্ত থেকেই। কাজেই মহাবিস্ফোরণ ঘটার মুহূর্তে কিংবা পূর্বে কি ছিল - এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন। অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিদ্যার নিয়ম আর সূত্র দিয়ে এ অদ্বৈত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, নিউটনের নিয়মাবলীকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বসহ অন্যান্য যে নিয়মগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অদ্বৈত বিন্দুতে গিয়ে সেগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমানে প্রকৃতিতে চারটি বল ক্রিয়াশীল - সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তাড়িতচৌম্বক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বল। এই চারটি বল 'সুপার ফোর্স' রূপে একসাথে মিশে ছিল সৃষ্টিমুহূর্ত থেকে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ড পরে কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের মতো মৌলিক কণিকাগুলো তৈরি হয়। সৃষ্টির তিন সেকেন্ড পরে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরি হলো নিউক্লিয়াস,